Complete knowledge of North Indian Tala

হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রতিষ্ঠা মুলতঃ মধ্যযুগে।দেখা যায় প্রাচীন ভারতীয় রাগ,স্বর,পদ,তালের ক্ষেত্রে এক পরিবর্তন তথা বিবর্তন সূচিত হয়েছিল এবং এই হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিটি মুলতঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে।তাঁর প্রচেষ্টাতেই হিন্দুস্থানের সমগ্র সংগীত এক ঐক্যবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় প্রাচীন সংগীতের তালের নানাবিধ উপকরণ এতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যেমন আছে,তেমনি বহু উপকরণের অনুপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন তাল পদ্ধতিতে যেমন ক্রিয়া অনুসারে তালের সশব্দ-নিঃশব্দ ভেদ তার গঠনকে একটি রূপ দিয়েছিল,তা পরবর্তীকালে অন্য নামাঙ্কিত হয়ে হিন্দুস্থানী তাল পদ্ধতিতে স্থান করে নিয়েছে।যেমন হিন্দুস্থানী তাল পদ্ধতিতে সশব্দ ক্রিয়া বোঝাতে 'তালি' শব্দটি আমদানি করা হয়েছে,আবার নানা রকমের নিঃশব্দ ক্রিয়া এক কথায় ফাঁক বলে চিহ্নিত হয়ে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।যা প্রাচীন ভারতীয় সংগীতে আঘাতের দ্বারা যেমন সশব্দ ক্রিয়া চিহ্নিত হয়েছিল আবার শূন্যে হস্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে নিঃশব্দ ক্রিয়া প্রদর্শনের যে প্রচলন ছিল তা হিন্দুস্থানী সংগীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্যভাবে গৃহীত হয়েছে এবং ঐ সময়ে সশব্দ ক্রিয়ার নানাভেদ ছিল,কিন্তু হিন্দুস্থানী সংগীতে তালের সেরূপ বিশেষ কোন ভেদ নেই যেটি গান্ধর্ব বা মার্গতালের ক্রিয়াটির অনুরূপ বলে মনে হয়। তেমনি অন্যদিকে নিঃশব্দ ক্রিয়ারও যে নানা ভেদ বা বৈচিত্র্য ছিল তা হিন্দুস্থানী ফাঁকে নেই।সুতরাং প্রাচীন তালের কিছু কিছু বিষয় গৃহীত হলেও সামগ্রিক বিষয় গৃহীত হয়নি।

প্রাচীন মাত্রা বিভাজনে অক্ষরগণনার প্রাধান্য ছিল।আমরা জানি সময়ের একক পরিমাপকে মাত্রা বলে।প্রাচীন মাত্রা নির্ধারিত হত যেমন 'ক চ ট ত প' এই অক্ষরগুলির একত্র উচ্চারণের যে সময় তাকে গ্রহণ করে।একটি ছিল গান্ধর্ব রীতি অনুসারী,অন্যটি দেশী পদ্ধতি অনুসারে অর্থাৎ এই চারটি লঘুবর্ণের দ্রুত উচ্চারণ কাল হবে বিলম্বিত লয়ের এক মাত্রা।সেখানে হিন্দুস্থানী সংগীতে এমন কোন অক্ষর সমষ্টির সমন্বয়ের পরিমাপ নেই যা দিয়ে একটি মাত্রার সময়কাল বা পরিমাপ নির্ধারিত হতে পারে।

হিন্দুস্থানী তাল পদ্ধতিতে তালের আসল সংখ্যা যে কত,সে সম্পর্কে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মোটেই সম্ভব নয়।এই পদ্ধতিতে আমরা অসংখ্য তালের পরিচয় পাই।বিচিত্র তাদের নাম,বিভিন্ন তাদের মাত্রা সমষ্টি।শুধু তাই নয়, একই তালের বিভিন্ন রকম মাত্রা সমষ্টির পরিচয়ও আমরা এই পদ্ধতিতে পাই।যেমন সওয়ারী।বিভিন্ন মাত্রাবিশিষ্ট অনেক রকম সওয়ারীর উল্লেখ আমরা পাই।

আবার একই মাত্রাবিশিষ্ট বিভিন্ন তালের পরিচয়ও এতে পাওয়া যায়।যেমন- ঝাঁপতাল ও সুলতাল। একই মাত্রাবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও দুটি তাল সম্পূর্ণ আলাদা

জাতের।দুটিই ১০মাত্রার তাল,কিন্তু বিভাগ এবং তালি-খালির কোন মিলই এদের মধ্যে নেই।

আবার একই মাত্রা সংখ্যা, একই বিভাগ ও একই তালি-খালি হওয়া সত্বেও দুটি তাল গানের দুটি ভিন্ন প্রকারের সঙ্গে বাজানো হচ্ছে এমন দৃষ্টান্তও আছে।যেমন- একতাল ও চৌতাল।দুটি তালই বারো মাত্রার, দুটিতেই ছয়টি করে বিভাগ,চারটি তালি ও দুটি খালি।কিন্তু চৌতাল বাজানো হচ্ছে ধ্রুপদ বা ধ্রুপদাঙ্গ গানের সঙ্গে।কোনো অবস্থাতেই চৌতালের বদলে একতাল বা একতালের বদলে চৌতালের প্রয়োগ হচ্ছে না।কারণ হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে গীতশৈলীর প্রকার অনুসারে একেবারে ছকে বেঁধে তালের ঠেকা রচিত হয়েছে মূলত সঙ্গতের প্রয়োজনে।

কিন্তু বৈচিত্রের এত উপকরণ থাকা সত্বেও হিন্দুস্থানী তাল পদ্ধতিতে জটিলতাও অনেক বেশী। জটিলতা বেশী বলেই খুব ভালভাবে সব তালগুলি আয়ত্ব করতে না পারলে এবং সবগুলির সঠিক পরিচয় ও প্রকৃতি জানা না থাকলে যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব নয়।তার ওপর জটিলতাকে আরও অনেক বেশী বাড়িয়ে তুলেছে এই পদ্ধতির অবৈজ্ঞানিক রীতিনীতি।